একক ৪৫ ❐ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ : বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ ও সিপাহীদের ভূমিকা

গঠন ঃ

৪৫.০ উদ্দেশ্য

৪৫.১ প্রস্তাবনা

৪৫.২ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ

৪৫.২.১ বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ

৪৫.২.২ ফৌজি বিদ্রোহ

৪৫.৩ সারাংশ

৪৫.৪ অনুশীলনী

৪৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে রাজন্যবর্গ এবং সিপাহীদের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই বিক্ষোভ ভারতের কোন্ কোন্ অঢ্চলে দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কেও আপনার ধারণা স্পষ্ট হবে। সামগ্রিকভাবে এই একক থেকে আপনি দেখবেন, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের পক্ষে হিতকারী তো হয়ই নি, বরং ভারতের জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই শাসনকে মেনে নিতেও পারেনি।

৪৫.১ প্রস্তাবনা

সামগ্রিকভাবে এর আগের তিনটি পর্যায়ে আপনি অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং ঔপনিবেশিক অভিঘাতের প্রথম পর্বের ইতিহাসের কথা পড়েছেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গানের প্রক্রিয়াই হ'ল ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। অষ্টাদশ শতকেকর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ; বিশেষ করে, তৃতীয় পর্যায়ে আপনি ঔপনিবেশিক শাসনের নানা দিক সম্পর্কে জেনেছেন। এই পর্যায়ে পাবেন সেই শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিবাদের গৌরবগাথা। আঞ্চলিক বিক্ষোভ, কৃষক বিদ্রোহ এবং উপজাতিদের

মধ্যে অসন্তোষের যে আগুন জ্বলেছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে সেটিকে আমরা দাবানলে রূপান্তরিত হ'তে দেখি।

৪৫.২ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ

১৭০৭ সালে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য অটুট রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারা কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষের অন্যতম রাজনৈতকি শক্তি হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রকট হয়। বিভিন্ন মারাঠা সর্দার নিজের নিজের ক্ষমতা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্য বিকাশ লাভ করে। উদাহরণত, বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের নাম করা যায়। অন্যদিকে, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ নিজেদের শক্তি সংহত করে। ক্রমে কোম্পানি ভারতের অধীশ্বর হয়ে ওঠে।

৪৫.২.১ বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ

ভারতে কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তার সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা অতীতে যেরকম অনায়াসে ঘটেছিল বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে তা, ঠিক নয়। যে সব রাজ্য দখল করে কোম্পানির শক্তি প্রসারিত হয়েছিল, সেকানকার ক্ষমতাচ্যুত শাসকবর্গ ও সেনাবাহিনী বিদ্রোহের দ্বজা বার বার তুলে ধরে। বাংলাদেশের উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করার পরেও ইংরেজরা দীর্ঘকাল নিষ্কন্টক ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনি। ১৭৫৯-'৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় শাহ আলম তিনবার পূর্বভারত আক্রমণ করেন। স্থানীয় বিক্ষুব্ধ ভূস্বামীরা তাঁকে সাহায্য করেন। মেদিনীপুর, মানভূম, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারদের ১৭৯০ সালের আগে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

ওয়ানের হেস্টিংসের আমলে চৈৎ সিংহের ঘটনা সুবিদিত। দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতবর্ষে কোম্পানির যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে হেস্টিংস তার উপর বারবার অন্যায়ভাবে বাড়তি অর্থ আদায়ের জন্য জুলুম গরেন এবং শেষপর্যন্ত তাকে গ্রেফতারে উদ্যত হন। রামনগরের একজদন প্রজা এই চাপ রুখতে কোম্পানির ফৌজকে আক্রমণ করেন। হেস্টিংস চুনার দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সুযোগ বুঝে চৈৎ সিংহ হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য আবার সক্রিয় হন। কিন্তু কোম্পানির সৈন্যদের কাছে শেষে হার মানেন। ১৭৯৯ সালে অযোধ্যার নবাব উজির আলি ফের কোম্পানির আদেশ অমান্য করেন। কিন্তু তার বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী উড়িষ্যা অধিকারের চেষ্টা করলে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে খুর্দার রাজার দেওয়ান জয়ী রাজগুরু ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেন। শেষ অবধি অবশ্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে তাঁকে হার মানতে হয়। উড়িষ্যার মোট রাজস্বের এক-দশমাংশ ব্রিটিশদের দিয়ে রাজা মুকুন্দদেব তাঁর হারানো রাজ্য ইংরেজদের কাছ থেকে ফিরে পান।

দক্ষিণ ভারতের সামন্তপ্রভুরা পলিগার নামে পরিচিত। ১৭৯৯ সালে তাদের নেতৃত্বে বিশাল একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বর্তমান কালের একজন ঐতিহাসিক (K. K. Rajayan) একে "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম" আখ্যা দিয়েছেন। আর্কটের নবাব ক্রমাগত তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করায় তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৭৮৩ সালে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে তাদের নেতৃত্ব দেয় পাঞ্জলাং কুরিচি নামক স্থানের নেতা কাট্টাবোম্মা নায়ক। ১৭৯৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন শিবগঙ্গা রাজ্যের প্রধান অমাত্য মারাডু পপাণ্ডিয়ান। তাঁর অন্যতম সহকারী ছিলেন ডিণ্ডিগুলের গোপাল নায়ক। ১৮০০ সালে বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিমোগা নামক স্থানে এক ভাগ্যান্বেষী ধুণ্ডিয়া ওয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে তিনি প্রাম দেন। ১৮০১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঞ্জোর, মাদুরাই প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকাংশই বিদ্রোহীদের দখলে ছিল। কোম্পানির সৈন্যরা কাবেরী নদী পার হ'তে পারেনি। তাঞ্জোর এবং পাদুকোট্টচাইর রাজবংশ এই দ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করে। শিবগঙ্গা রাজ্যের সিংহাসনের অন্য এক দাবিদার উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮০১ সালের ১লা অকোটবর দক্ষিণভারতের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই বিতোহ দমন করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়। মারাডু পাণ্ডিয়ান এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত কিছু অনুগামী ইংরেজদের হাতে প্রাণ দেন। নেতাহ দেহ যেখানে কবরস্থ হয় তার কাছে তাঁর অনুগামীরা একটি মন্দির নির্মাণ করে। বিদ্রোহ দমনে ইংরেজরা একজন বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিয়েছিল।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ওপর ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ১৮০৮ সালের শেষদিকে সে রাজ্যের দেওয়ান ভেলু তাম্পি পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি সেকানকার ইংরেজ দূতাবাস আক্রমণ করেন। প্রতিবেশী কোচিন রাজ্যের দেওয়ান তার সঙ্গে যোগ দেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮০৯ সালে ভেলু তাম্পি দু'বার যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয় (২০শে মার্চ, ১৮০৯)। শূলবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর শবদেহ ত্রিবান্দ্রামের পথে পথে প্রদর্শিত হয়। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল এই অমানবিতাকে ধিক্কার না জানিয়ে পারেননি।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশাখাপত্তনম দখল করার পর সেখানকার জমিদার ভিজিয়েরাম রাউজ হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কাশীপুরম নামক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল বিশাখাপত্তনমের প্রতিবেশী। সেকানকার শাক ইংরেজদের কর্তৃত্ব রোদের চে্টা করেন। মাদ্রাজে তখন শাসনকর্তা ছিলেন স্যার চার্লস ওকলি। তিনি বিদ্রোহীদের অধিকাংশের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করেন। এর ফলে সংগ্রাম আর বিস্তারলাভ করেনি। বিদ্রোহীদের অনেকেই সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল। বিশাখাপত্তনমের নিহত প্রধান ভিজয়রামের পুত্র নারায়ণ রাউজ এর ব্যতিক্রম ছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে তাঁর রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর রাজ্যের সীমানা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সঙ্কুচিত হয়। বিশাখাপত্তনমের থেকে ইংরেজরা চড়া হারে রাজস্ব আদায় করতে থাকে। এই বর্ধিত রাজস্বহার দেবার ক্ষমতা রাজ্যের ছিল না। ১৮২৭ সালে সেখানে আবার বিদ্রোহ হয়। এবারে নেতৃত্ব দেন বীরভদ্র রাউজ। তাঁর ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ ইংরেজরা বরাদ্দ করেছিল তার চেয়ে বেশি অর্থ তিনি

দাবী করেন। বিদ্রোহ ছ'বছর স্থায়ী হয়েছিল। বিশাখাপত্তনমের অন্তর্গত পালকোণ্ডা নামক স্থানেও ১৮৩১-৩২ সালে বিদ্রোহ ঘটে গিয়েছিল।

কিট্টুর (বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের বেলগাঁও জেলায় অবস্থিত) ১৮২৪ সালে রাণী চেন্নাম্মা-র নেতৃত্বে বিদ্রোহ কর। শিবলিঙ্গা সর্জা সেই স্থান শাসন করতেন। ১৮২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তার বিমাতা চেন্নাম্মা দত্তক পুত্র গ্রহণ করে তার নামে রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন। ধারওয়ার অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রাহক ম্যাকারে এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়ে বলেন দত্তক পুত্র হিসাবে যাকে নেওয়া হয়েছে সেই শিবলিগাপ্পা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেননি। বোম্বাইয়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে তিনি তাঁর অভিযোগ জানান এবং কিট্টুরের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁর প্রাণ যায়; তারপর দক্ষিণভারতের ইংরেজ কমিশনার চ্যাপলিন ১৮২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচুর সৈন্য সমেত কিট্টুর আক্রমণ করেন। রানী চেন্নাম্মা তাদের হাতে বন্দী হন। কিট্টুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বন্দী থাকাকালে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রাণী মারা যান। শিবলিঙ্গাপ্পার পক্ষ অবলম্বন করলেন সাঙ্গোল্লি রায়ান্ন। কিট্টুর বাহিনীতে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সুরাপুর (বর্তমান গুলবর্গা জেলাভুক্ত) অঞ্চলের শাসকের সহায়তা তিনি প্রার্থনা করেন। বিশ্বাসঘাতকরা তাঁকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেয়। (১৮২৯) ভবিষ্যৎ গোলযোগের পথ বন্ধ করতে ইংরেজরা শিবলিঙ্গাপ্পাকে বন্দী করে। এর পরেও অবশ্য ১৮৩৩ এবং ১৮৩৬ সালে কিট্টুর অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়েছিল, তবে দু'বারই ইংরেজরা তা' দমন করতে সক্ষম হয়।

১৮৩৪ সালে ইংরেজরা কুর্গ দখল করে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৮৩৫ সালেস্বামী অপরম্পরা নামে এক ধর্মগুরু (জঙ্গম) বিদ্রোহ করেন। ইংরেজদের হাতে তিনি ধরা পড়েন। কল্যাণস্বামী নামে অপর এক ব্যক্তি কুর্গের যুবরাজ হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যান। তাকেও ইংরেজরা গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তার আদর্শকে সামনে রেখে আরও দু'বছর কুর্গ এবং সংলগ্ন কানাড়া উপকূলে বিদ্রোহের শিখা জ্বলতে থাকে। বিদ্রোহীরা একসময় এতটাই শক্তি সঞ্চয় করেছিল যে, দক্ষিণ কানাড়ার কালেক্টর কিছুকালের জন্য স্থানত্যাগে বাধ্য হন।

গুজরাটে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নবনগরের রাজা বাধাদানের চেষ্টা করেন (১৮১৫)। কচ্ছের রাজা রাও দ্বিতীয় ভারমল তাঁকে সমর্থন জানান। ১৮১৯ সালে তিনি পদচ্যুত হন। সাওন্তওয়াড়ির রাজা রামদুর্গাবাঈ তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত হন। ১৮৩৯ সালে তাঁর অনুগত অভিজাতবর্গ গোয়া থেকে ইংরেজদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণ ব্যর্থ হ'লে পাঁচ বছর পর সাওন্তওয়াড়ির যুবরাজ আন্না সাহেব এবং সে এলাকার অন্যতম সামন্তপ্রভু ফন্দ সাবন্ত আরও ব্যাপক প্রতিরোধ সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সাওন্তওয়াড়িপ ইংরেজদের অধিকারে আসে। ফন্দ সাবন্ত বংশের বিভিন্ন শাখার সম্ভাব্য উত্তরসূরীদের ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত গোয়ায় ইংরেজরা আটক রাখে। মহাবিদ্রোহের সময় সেখানে থেকে পালিয়ে এসে ১৮৫৯ সালে তারা আবার বিদ্রোহ করে, কিন্তু এতেও তারা ব্যর্থ হয়।

উত্তরভারতের ভরতপুর দুর্গ দীর্ঘকাল দুর্ভেদ্য ছিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় ১৮০৫

সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজরা চারবার চেষ্টা করেও দুর্গ দখল করতে পারেনি। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সূচনায় ব্রহ্মদেশে কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর প্রাথমিক নাকাল হওয়ার খবর এদেশে পৌঁছলে ভরতপুরের জাঠ নেতা দুর্জন শাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আলোয়ার, জয়পুর, যোধপুর এবং কোরাউলি রাজ্যের সৈন্য তাঁকে সাহায্য করতে আসে। তৎসত্ত্বেও এবার কিন্তু ভরতপুর দুর্গ দখল ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়। হাটরাস দুর্গের সেনাধ্যক্ষ দয়ানায়ক ছিলেন আলিগড়ের অন্যতম শক্তিশালী তালুকদার। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮১৭ সালে তিনি অস্ত্রধারণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ঊনিশ শতকের শুরুতে গোপাল সিংহ নামে জনৈক আঞ্চলিক সর্দার বুন্দেলখণ্ডে কোম্পানির হস্তক্ষেপে বাধা দেন। ইংরেজরা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

৪৫.২.২ ফৌজি বিদ্রোহ

ভারতবর্ষের ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ইস্ট ইন্ডিয়া সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয় সিপাহীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৬৪ সালে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে আমরা তাদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের কথা প্রথম শুনি। সেনাপতি মেজর হেকটর মানরো বিক্ষোভের দাবি প্রধানত যে সব সিপাহীরা পেশ করেছিল তাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দেন। অধিকাংশ সিপাই ছিল হিন্দু। মুসলমানরা তখনও কোম্পানির শাসন মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু সিপাইদের মনে নানারকম সংস্কার কাজ করত। সমুদ্রযাত্রায় তাদের বিশেষ আপত্তি ছিল। কেবল জাহাজে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য কিংবা নিজেদের পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে নয়, সমুদ্রযাত্রা করলে সমাজ তাদের একঘরে করত। নিয়োগের শর্তানুযায়ী সমুদ্রযাত্রার কোনওরকম বাধ্যবাধকতা সিপাইদের না থাকলেও কার্যকালে যথাযথ নির্দেশ পালন না করলে সৈন্যদের বরখাস্ত করা হ'ত। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে প্রধান অভিযুক্তদের সাধারণত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে সিপাইদের সংস্কার ছিল এত বদ্ধমূল যে, ১৭৮২-'৮৪ সালের মধ্যে এতে সম্মত না হওয়ার কারণে পাঁচটি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। একই কারণে ১৭৯৫ সালে সিপাইদের অপর একটি কোম্পানি ভেঙে দেওয়া হয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির সিপাহীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ঘটে ভেলোর এবং ব্যারাকপুরে। ১৮০৬ সালের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজে কোম্পানির সিপাহীদের উষ্ণীয়ের ওপর চামড়া এবং সুতোয় বোনা কাপড় যুক্ত হয়। চামড়ার ব্যবহারে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরা ক্ষুব্ধ বোধ করে। হিন্দুদের কাছে গোরুর চামড়া নিষিদ্ধ বস্তু। অনুরূপভাবে মুসলমানদের কাছে শুকরের চামড়া অব্যবহার্য। উষ্ণীষের ওপর যুক্ত চামড়া কোন্ প্রকৃতির জানা না থাকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোম্পানি তাদের ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করছে বলে গুজব রটে। উপরন্তু, হিন্দুদের তিলক চিহ্ন ধারণ নিষিদ্ধ হয়। মুসলমানদের মধ্যে গোঁফ রাখার চল ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে তা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ সম্বলিত প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ভেলোরের সিপাহীরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি দেওয়ার ফলে জুন মাসে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন করে ইন্ধন যোগায় অবার তাতে টিপু সুলতানের বংশধররা। ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গাপত্তনের পতনের পর এদের ভেলোরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সিপাহীদের অসন্তোষের সুযোগ

নিয়ে তারা বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব কেবল তারা গ্রহণ করেনি। তা সাফল্যমন্ডিত হ'লে সিপাহীদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিও দেয়।

ভেলোরে সিপাহীরা ১৮০৬ সালের ৯ জুলাই মাসের রাত্রি দুটোয় ইউরোপীয়দের আবাসনের ওপর গোলাবর্ষণ করে ; টিপু সুলতানের নিশান তারা উড়িয়ে দেয়। নারী ও শিশুদের ওপর তারা কোনও অত্যাচার করেনি। টিপু বংশধররা কার্যক্ষেত্রে ভীরু প্রমাণিত হয়। আর্কট থেকে ইংরেজ সামরিক সাহায্য যখন ভেলোরে এসে পৌঁছয় তখন দেখা যায় সেখানকার ভারতীয় সিপাহীরা মূল লক্ষ্য ভুলে ইংরেজদের সম্পত্তি লুণ্ঠনে ব্যস্ত। কোনওরূপ বাধা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিদ্রোহ দমনের পর টিপুর পুত্রদের ভেলোর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

কোনও দূর দেশে সামরিক অভিযানের সময় কোম্পানির সিপাহীরা স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থার তুলনায় দ্বিগুণ হারে বাট্টা বা উপরি অর্থ লাভ করত। ১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে কোম্পানির প্রথম যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ব্যারাকপুরের ৪৭ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রি এই বর্ধিত বাট্টা না পাওয়ায় শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে রাজি হয়নি। তারা আরও ক্ষুব্ধ হয়েছিল রসদ বহনকারী ষাঁড়গুলির অত্যধিক মূল্য ধার্য হওয়ায়। ১৮২৪ সালে ৩০শে অক্টোবরের কুচকাওয়াডেজ তারা তাদের অস্ত্র ছাড়াই অংশগ্রহণ করে। তাদের অস্ত্রগুলি আনতে বললে তারা নির্দেশ অমান্য করে। অন্যরা তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। সেনাধ্যক্ষ স্যার এডোয়ার্ড পাজেট কলকাতা থেকে ছুটে আসেন।

নিয়মিত সৈন্যদের বিকল্প হিসাবে অন্যদের নিয়োগ করে লুকিয়ে রাখা হ'ল। বিদ্রোহ চলতে থাকলে বদলীদের বলা হয় নিয়মিত সৈন্যদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে। ৪৭ নম্বর রেজিমেন্ট্রে সিপাহীরা যখন কুচকাওয়াজড করছে তখন তাদের প্যারেড চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথা তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখার হুকুম ছিল। সিপাহীরা এর পরও বিদ্রোহ চালিয়ে গেলে পিছন থেকে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

ব্যারাকপুরের সেনাবিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করতে যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করকা হয়েছিল, তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানায় ১৮২৪ সালের ২৪শে নভেম্বর। সৈন্যদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভের প্রতিবিধান না হওয়ায় তারা বিদ্রোহ করেছিল বলে কমিটি স্বীকার করে। বেঙ্গাল আর্মি গঠিত হ'ত প্রধানত অযোধ্যা, বিহার এবং বারানসীর লস্কর দিয়ে। বাংলাাদেশর তথা সমগ্র পূর্ব-ভারতের আবহাওয়া তাদের পছন্দ হয়নি। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তাদের কোনওরূপ বেতন বৃদ্ধি ঘটেনি। মাসিক সাত টাকা ছিল তাদের উপার্জন। এই সামান্য অর্থ দিয়ে তাদের খাদ্য ও বাসস্থান, পরিবহন এবং উর্দির ব্যয় মেটাতে হ'ত। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছিল, পৃথিবীতে আর কোথাও সৈন্যদেরপ সাজসরঞ্জামের ব্যয় এত অল্প উপার্জনে মেটাতে হ'ত না। শস্যমূল্য মণ পিছু সাড়ে তিন টাকার বেশি হ'লেও ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির ডিরেক্টররা সিপাহীদের জন্য বাড়লতি অর্থ বরাদ্দ করেনি। বিদ্রোহের সময় ৪৭ নমব্র রেজিডমেন্টের অনেক সৈন্যরাই রসদ বইবার জন্য পিঠের ঝোলা ছিল না। যদি বা ছিল, অনকের ক্ষেত্রে তা আবার শতচ্ছিন্ন আকার ধারণ করে।

ব্যারাকপুরের ফৌজী অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তদন্ত কমিটি আরও বলে,

সেনাবাহিনীতে উন্নতির প্রক্রিয়া ছিল বড় দীর্ঘসূত্র। ইউরোপীয় ফৌজী অফিসাররা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বেতন পেত। উপরন্তু তাদের জীবনে উন্নতি করার আরও অনেক পথ খোলা ছিল। সিপাহীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ধাপে ধাপে খারাপ হচ্ছিল। যে কোনও বিদ্রোহের সময়ে দেখা যেত সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা অপেক্ষাকৃত নবাগত। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরনো অফিসাররা সৈন্যবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র রুজি-রোজগারের সন্ধানে ব্যস্ত।

ব্যারাপুরের এই ফৌজী বিদ্রোহের স্মৃতি সিপাহীরা দীর্ঘকাল অন্তরে বহন করেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে দেখা যায় যে, ব্যারাকপুরের সিপাহীরা ১৮২৪ সালের বিদ্রোহের সময়ে এক ব্রাহ্মণ নেতার ব্যবহৃত উপকরণ সযত্নে আগলে এসেছে। যে ঘটনার কথা তারা কখনও বোলেনি। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের পরর পছর আসামের গ্রেনেডিয়ার কোম্পানি প্রতিকূল আবহাওয়ায় অভিযান করতে চায়নি। এই অপরাধে তাদের বরখাস্ত করা হয়; নেতারা চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৮৩৮ সালে সোলাপুরে ভারতীয় সৈন্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করেচিল। সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থলের সৈন্যরা নিয়মিত বাট্টান না পাওয়ায় ১৮৪৮ সালে বিদ্রোহ করে।

১৮৩৮-৪২ সালে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ চলার সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হিন্দুদের ভয় ছিল দূরদেশে মুসলমানদের হাতের রান্না খেলে জাত যাবে। অন্যদিকে মুসলমানরা স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধ করতে চায়নি। পর্যাপ্ত রসদের অভাবেও সৈন্যরা ক্ষুব্ধ বোধ করে। ভেড়ার চামড়ায় তৈরি জাকেট পরে লড়াই করতে হওয়ার ফরে হিন্দুদের মনে জাত যাওয়ার ভয় দেখা দিয়েছিল; মুসলমানদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

সিন্ধু প্রদেশ অবস্থিত ১৮৪৪ সালে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সময় চৌষট্টি নম্বর রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে। সিন্ধু দেশ ইতিমধ্যে ইংরেজরা জয় করার ফলে সেখানকার সিপাহীরা বহির্দেশ আক্রমণের সময় বরাদ্দ বাড়তি ভাতার সুযোগ পায়নি। এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করে। এই অপরাধে তাদের নেতাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। রেজিমেন্ট অফিসার ফৌজীদের কাছে অবস্থার পরিবর্তন গুছিয়ে বলেননি বলে বরখাস্ত হন। মাদ্রাজের সিপাহীদের সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে অভিযান করতে বলা হ'লে তারাও একইভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। সেনাবাহিনীর আরও দু'টি রেজিমেন্টকে এই কারণে ভেঙে দেওয়া হয়।

বেতন সংকোচনের কারণে ১৮৪৩ সালে ছয় নম্বর মাদ্রাজ ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাদের জব্বলপুরে আনা হয়েছিল, সেখানে অল্পদিন কাটাতে হবে বলে। বাস্তবে কিছু সেখানে তাদের অপেক্ষাকৃত কম বেতনে স্থায়ী ছাউনি গড়তে বড়া হয়। ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ স্যার চার্লস নেপিয়ার হঠাৎ দেখেন পাঞ্জাবে চব্বিশটি রেজিমেন্ট বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজছে। ১৮৫০ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি গোবিন্দগড়ে সেনাবিদ্রোহ হয়। ঘটনার পর নোপিয়ার সেনাদের ভাতা বাড়াতে চান। কিন্তু বড়লাট লর্ড ডালহৌসী প্রয়োজনীয় অনুমতি দেননি। ক্ষুব্ধ নোপিয়ার পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার সাত বছর পর ফৌজী অসন্তোষ ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আকার ধারণ করে।

৪৫.৩ সারাংশ

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারা কিছুদিন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে তাদের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করে ; যথা বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও শক্তি সঞ্চয় করে।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা প্রসারের বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত রাজন্যবপর্গ প্রায়শই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বাংলার ১৭৯০ সালের আগে স্থানীয় ভূস্বামীদের ইংরেজরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। উত্তরভারতে চৈৎসিংহের বিদ্রোহ সুবিদিত। উড়িষ্যায় খুর্দার রাজা ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। দক্ষিণভারতের সামন্তপ্রভুরা (পালিগার) ১৭৯৯ সকালে বিদ্রোহ করে। শেষপর্যন্ত ১৮০১ সালে ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উপর ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ১৮১৮ সালে সেখানকার রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮০৯ সালে সে বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিশাখাপত্তনমের জমিদার ও প্রতিবেশী কাশীপুরমের শাসক ইংরেজ আগ্রাসন প্রতিরোদের চে্টা করেন। ইংরেজরা আপোষমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় বিদ্রোহ প্রসারলাভ করতে পারেনি, তবে ১৮২৭ সালে সেখানে আবার বিদ্রোহ হয় এবং তা ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১৮২৪, ১৮৩৩ এবং ১৮৩৬ সালে কিট্টুরের শাসনকর্তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৮৩৫ সালে কুর্গের রাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইংরেজরা তা দমন করলেও আরও দু'বছর কুর্গ এবং সংলগ্ন কানাড়া উপকূলে বিদ্রোহের শিখা জ্বলতে থাকে। ১৮১৫ সালে গুজরাটে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নবনগরের রাজা বাধাদানের চেষ্টা করেন। কচ্ছের রাজা তাঁকে সমর্থন জানান। ১৮৩৯ সালে শাওন্তওয়াড়ির রাজার অনুগত অভিজাতবর্গ গোয়া থেকে ইংরেজদের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। ১৮৪৯ সালে সেখানে আবার বিদ্রোহ হয়। উত্তরভারতে ভরতপুরের জাঠ নেতা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাঁকে সাহায্য করেন। আলিগড়ের তালুকদারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ঊনিশ শতকের শুরুতে গোপাল সিংহ নামে বুন্দেলখণ্ডের আঞ্চলিক সর্দার কোম্পানির হস্তক্ষেপে বাধা দেন। ইংরেজরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয় সিপাহীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তা' সত্ত্বেও ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের ঘটনা কম ঘটেনি। ১৭৬৪ সালে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আমরা তাদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের কথা প্রথম শুনি। সে সময় অধিকাংশ সিপাহী ছিল হিন্দু। মুসলমানরা কোম্পানির শাসন মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু সিপাহীদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি ছিল। এর বিরুদ্ধে সিপাহীদের সংস্কার এত বদ্ধমূল ছিল যে, ১৭৮২-৮৪ সালের মধ্যে এ কারণে পাঁচটি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। উনিশ শতেকর প্রথমার্ধে কোম্পানির সিপাহীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ঘটে ভেলোর এবং ব্যাপাকপুরে। ব্যারাকপুরের সেনাবিদ্রোহের কারণ ছিল দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বঞ্চনার শিকার হওয়া ; যথা, কম

বেতন, নিষিদ্ধ প্রাণীর চামড়ার পোষাক ব্যবহারে বাধ্য হওয়া, কম খাদ্য, উন্নতির দীর্ঘসূতরি্তা প্রভৃতি। ১৮৩৮ স,ালে সোলাপুরে ভারতীয় সৈন্যরা অসন্তো, প্রকাশ করেছিল। সেকেন্দ্রবাদ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের সৈন্যরা নিয়মমত বাট্টা না পাওয়ায় ১৮৪৮ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৩৮-৪২ সালে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ চলার সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সিন্ধুপ্রদেশে ১৮৪৪ সালে ৬৪নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে। বেতন সংকোচনের কারণে ১৮৪৩ সালে ৬নং মাদ্রাজ ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবে ২৪টি রেজিমেন্ট বিদ্রোহের সুযোগ ঘোঁজে। ১৮৫০ সালে গোবিন্দগড়ে সেনাবিদ্রোহ হয়। এই ঘটনার সাতবছর পর ফৌজী অসন্তোষ মহাবিদ্রোহের আকার ধারণ করে।

৪৫.৪ অনুশীলনী

১। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে প্রতিরোধ আন্দোলন কি রূপ নেয়? বিশ্লেষণ করুন।

২। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করুন।

৩। টীকা লিখুন :

(ক) ১৭৯৯ থেকে ১৮০১ সালের পলিগার বিদ্রোহ।

(খ) রানি চেন্নামা।

(গ) ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮০৬)।

(ঘ) বিশাখাপত্তনমের ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম।

(ঙ) ব্যারাকপুরের ফৌজি বিদ্রোহ (১৮২৪)।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) ১৮০৪ সালে ইংরাজদের বিরুদ্ধে উড়িষ্যায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন _____।

(খ) ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন _____ সালে।

(গ) ১৮০৬ সালে দক্ষিণভারতের _____ সৈন্য বিদ্রোহ হয়।

৪৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।

২। S. B. Chaudhuri : Civil Disturbances during British Rule in India.

৩। Nikhiles Guha : "Resistance to British Rule—The Early Phase" in N. R. Ray, ed. *Hundred Years of Freedom Struggle,* 1847-1947.